জানার আছে অনেক কিছু সিরিজ ॥ ৩

মহাবিশ্বের জন্ম রহস্য

আলী ইমাম

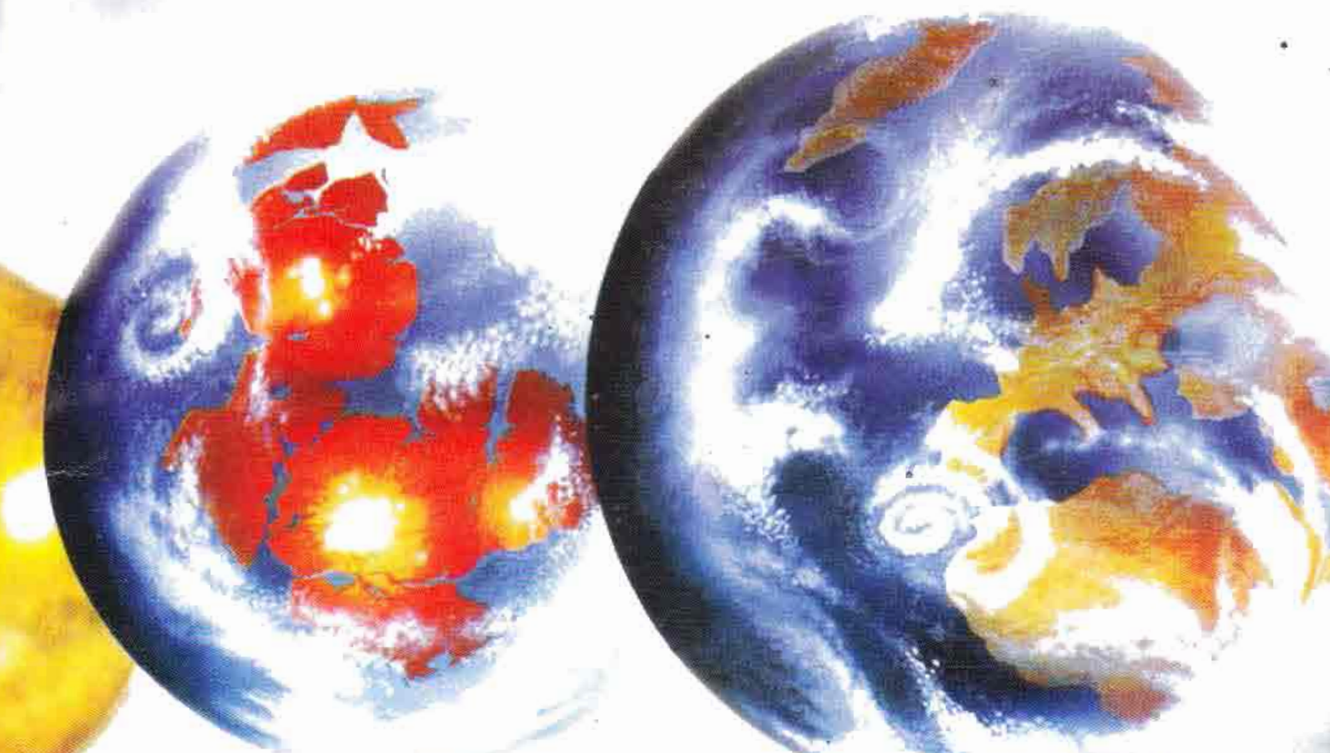

জানার আছে অনেক কিছু ॥ ৩

মহাবিশ্বের জন্ম রহস্য

আলী ইমাম

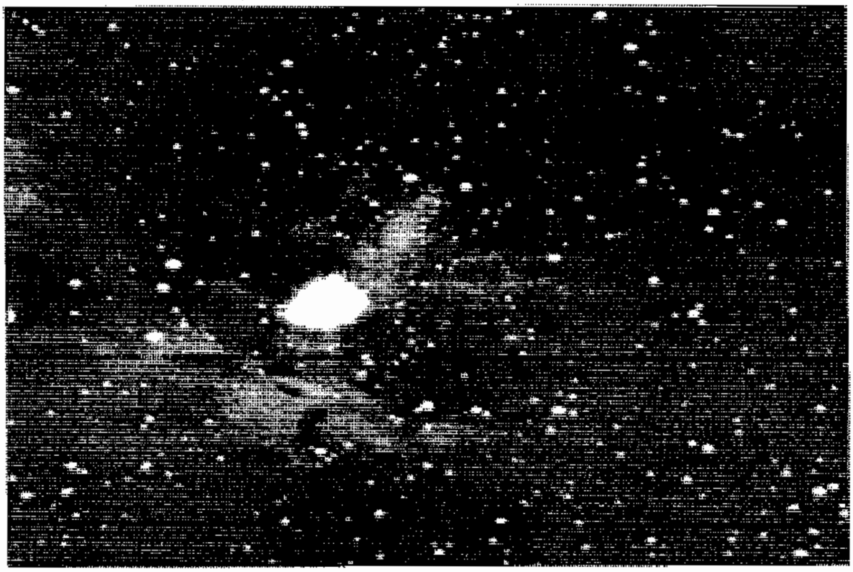

এশিয়া পাবলিকেশনস ঢাকা

www.banglainternet.com

জানার আছে অনেক কিছু ।। ৩

মহাবিশ্বের জন্ম রহস্য

আলী ইমাম

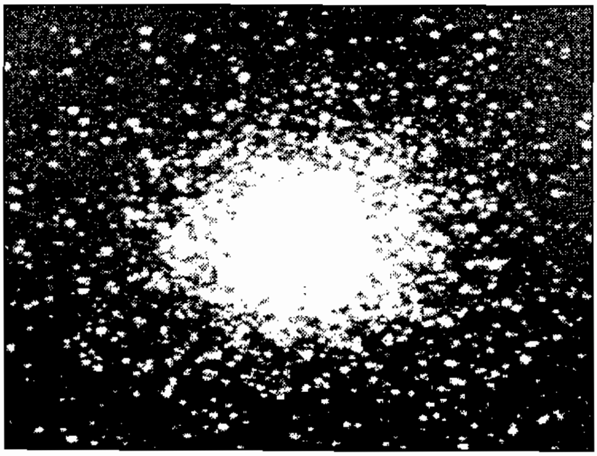

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০৬

প্রকাশক : ইসমাইল হোসেন বকুল
এশিয়া পাবলিকেশনস
৩৬/৭ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

স্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : শ্রাবণ মাহমুদ অপু

বই নকশা : মোশতাক রায়হান

অক্ষর বিন্যাস : শাপলা দোয়েল মিডিয়া
৩০৭-সি খিলগাঁও চৌধুরীপাড়া, ঢাকা ১২১৯

মুদ্রণ : সালমানী প্রিন্টার্স
৩০/৫ নয়াবাজার, ঢাকা-১০০০

মূল্য : ৪০ টাকা

ISBN : 984-872-182-8

www.banglainternet.com

উ ৎ স র্গ

আলিফ ও লাম

Scanned By Shahadat Hussain

Scanned By Shahadat Hussain

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

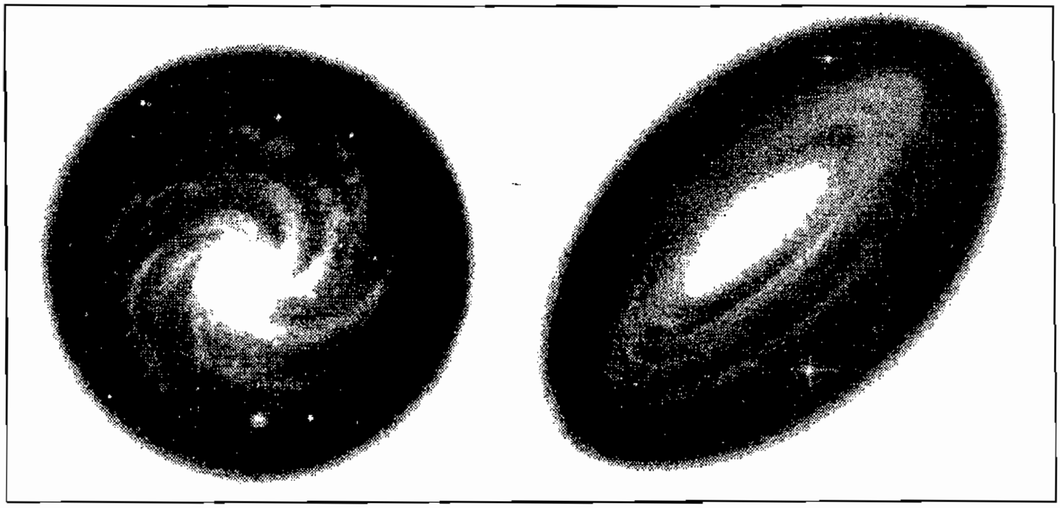

মহাবিশ্বের সৃষ্টি কেমন করে হলো তা জানার জন্য প্রচুর গবেষণা চলেছে। চলছে। এর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। কোনো রহস্যের ঘনীভূত কুয়াশার আড়ালে ঢেকে রয়েছে এই জন্মরহস্য।

বেশকিছু মতবাদ আছে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি নিয়ে।

১৯৩০ সালে চেম্বারলেন ও ফুলটন দিলেন 'গ্রহাণুপুঞ্জ তত্ত্ব'। তাদের মতে, সূদূর অতীতে নাকি সূর্যের সাথে মহাকাশে ঘুরে বেড়ানো অজানা একটি নক্ষত্রের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। এর ফলে সূর্যের খানিকটা অংশ ছিটকে বেরিয়ে এসে অসংখ্য ছোট-বড় গ্রহকণা বা গ্রহাণুপুঞ্জে পরিণত হয়। তারপর সময়ের সাথে সাথে সেই গ্রহকণাগুলো শীতল হয়ে জমে গিয়ে সৃষ্টি হয় সৌর জগতের গ্রহমণ্ডলীর।

এর কুড়ি বছর পর জিনস ও জেফরিস নামের দু'জন বিজ্ঞানী বললেন, নক্ষত্রটি মহাকাশের বুকে বিচরণ করতে করতে যখন সূর্যের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিল সে সময় সূর্যের উত্তপ্ত শরীর থেকে খানিকটা অংশ গ্যাস হিসেবে ছিটকে বেরিয়ে আসে। তারপর উত্তপ্ত অবস্থাতেই সৃষ্টি হয় গ্রহমণ্ডলীর। এই দুটো তত্ত্ব সে সময় যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আধুনিক কালে তা বাতিল হয়েছে।

বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বিজ্ঞানী জে. স্মিথ তার উল্কাতত্ত্ব প্রকাশ করলেন। তার মতে, মহাকাশের বুকে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নক্ষত্র আর

www.banglainternet.com

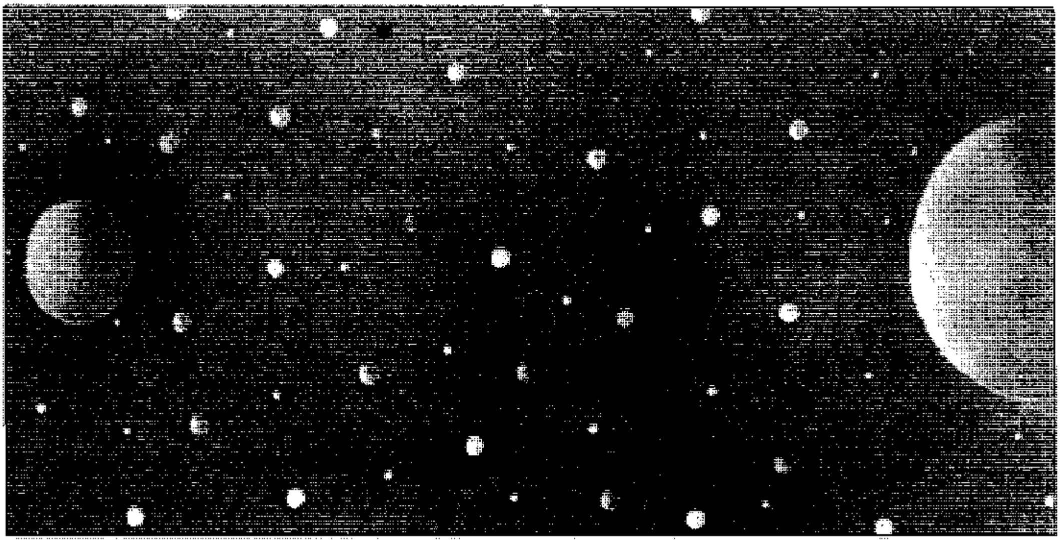

ছায়াপথ। এমনি এক ছায়াপথ বা নক্ষত্রপুঞ্জের ভেতর দিয়ে যাবার সময় সূর্য নিজের শরীরের চারপাশে চাদরের মতো জড়িয়ে নেয় উল্কাজাতীয় জিনিস। যা অনন্তকাল ধরে নক্ষত্রপুঞ্জের ভেতরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। তারপর সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে ঘুরতে ঘুরতে সেই উল্কাজাতীয় পদার্থ থেকেই জন্ম নিয়েছে এই গ্রহমণ্ডলী।

আধুনিক কালের বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বের প্রতিও আস্থা রাখেননি।

মহাবিশ্বের জন্মরহস্য সম্পর্কে এখন পর্যন্ত যে সূত্রটি স্বীকৃত হয়ে আছে তা হলো বিস্ফোরণবাদ বা বিগ ব্যাং তত্ত্ব। বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রায় দেড় হাজার থেকে দু'হাজার কোটি বছর আগে এক মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল এই মহাবিশ্বের।

ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্বমুহূর্তে বস্তু বলতে কিছু ছিল না। ছিল শুধু শক্তি। সে শক্তি ছিল পুঞ্জীভূত অবস্থায়। প্রায় ১ হাজার ৫ শ' কোটি বছর আগে ঘটল অকল্পনীয় এক বিস্ফোরণ। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যার নাম দিয়েছেন 'বিগ ব্যাং'। এর ফলে কিছু পরিমাণ শক্তি রূপান্তরিত হলো পারমাণবিক কণায়, সৃষ্ট হলো প্রোটন, ইলেকট্রন প্রভৃতি। মেঘের মতো পরিব্যাপ্ত হলো তারা। প্রোটন এবং ইলেকট্রনে থাকে বিদ্যুতের আধান।

www.banglainternet.com

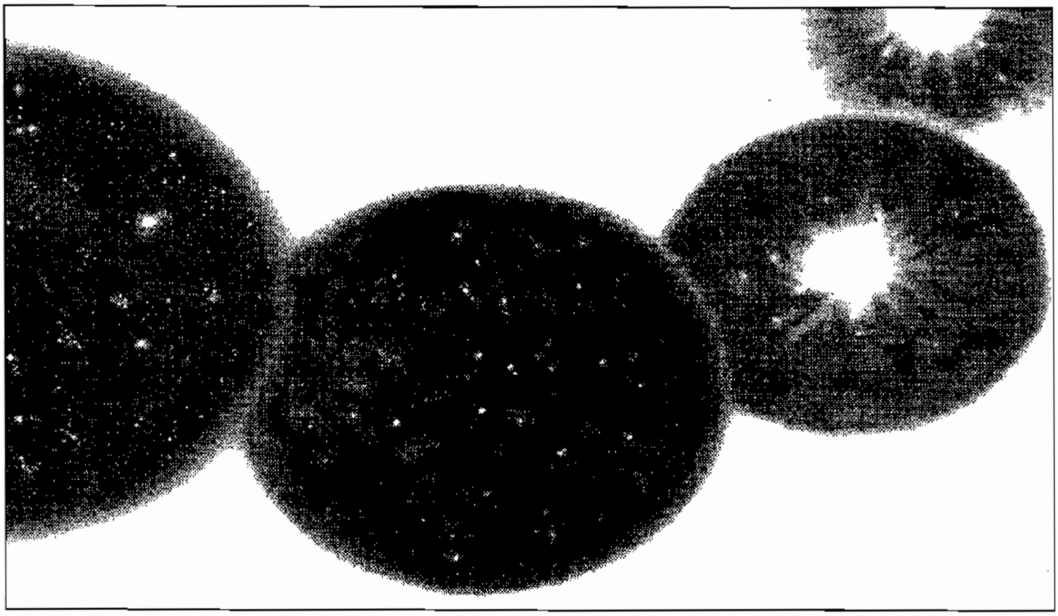

তাই তাদের ঘিরে থাকে বিদ্যুৎ ক্ষেত্র। বেতার তরঙ্গ এই বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে না। আর বিগ ব্যাং-এর পর এভাবেই চলছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর। তারপর প্রোটন এবং ইলেক্ট্রনের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নভাবে বিচরণ বন্ধ হতে থাকল। প্রোটন কণাগুলো ঘিরে পরিক্রমণ শুরু করল ইলেকট্রন কণা। সৃষ্ট হলো হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম পরমাণু। পারমাণবিক অবস্থায় বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ বলে এবার তাদের চারপাশে বিদ্যুৎ ক্ষেত্র রইল না। বিগ ব্যাং-এর সময়ে সৃষ্ট কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন-এর পথ বাধামুক্ত হলো।

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি রহস্যের সন্ধানে নাসা কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ড একসপ্লোরার নামে একটি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করল। উপগ্রহটি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫৫৯ মাইল দূরের একটি নির্দিষ্ট পথে পৃথিবীকে পরিক্রমণ করবে। সেই সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের প্রাচীনতম বার্তাবাহী বেতার তরঙ্গকে বিশ্লেষণ করে উদঘাটন করার চেষ্টা করবে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদি রহস্য।

বিগ ব্যাং বা অতিনাক্ষত্রিক বিস্ফোরণ তো ঘটেছিল কত বছর আগে। আজ থেকে ১ হাজার থেকে ২ হাজার কোটি বছরের মধ্যে কোনো এক সময়।

www.banglainternet.com

প্রচলিত তত্ত্ব অনুযায়ী বিস্ফোরণের পর স্বল্পকালের মধ্যেই ১০০০ থেকে ১০ হাজার কোটি নক্ষত্র নিয়ে তৈরি হয় একেকটি গ্যালাক্সি বা নক্ষত্রজগত। হাইড্রোজেনের পরিব্যাপ্ত মেঘ ঘনীভূত হয়েই সৃষ্ট হয় তাবৎ নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহ। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই কাজটি বিগ ব্যাং-এর পর কয়েকশ' কোটি বছরের মধ্যেই শেষ হয়েছিল।

কিন্তু তাত্ত্বিকরা ভাবেন এক আর বাস্তব চিত্রটি দাঁড়ায় অন্য রকম। এ বছর ২৯ আগস্ট প্রচলিত ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন দুই জ্যোতির্বিজ্ঞানী রেডিও টেলিস্কোপ কেন্দ্রের রিকারদো গিওভার্নেল্লি এবং কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেনেস। তারা জানিয়েছেন, পৃথিবী থেকে সাড়ে ছয় কোটি আলোকবছর দূরে অতিকায় একটি মেঘের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। হাইড্রোজেনের এই মেঘ আবর্তন করছে খুবই ধীরগতিতে। তাদের মনে হয়েছে, গ্যালাক্সি সৃষ্টির গোড়ায় ব্রহ্মাণ্ডে এ ধরনের মেঘই বিরাজ করত। এই মেঘই পরবর্তীকালে সৃষ্টি করেছে একেকটি নক্ষত্র। নব আবিষ্কৃত এই মেঘটির চেহারা ডিমের মতো। যেন মনে হয় একটি খাম। তার ভেতরে রয়েছে অতিকায় দু'টি গ্যাসের পিণ্ড। কোনো এক

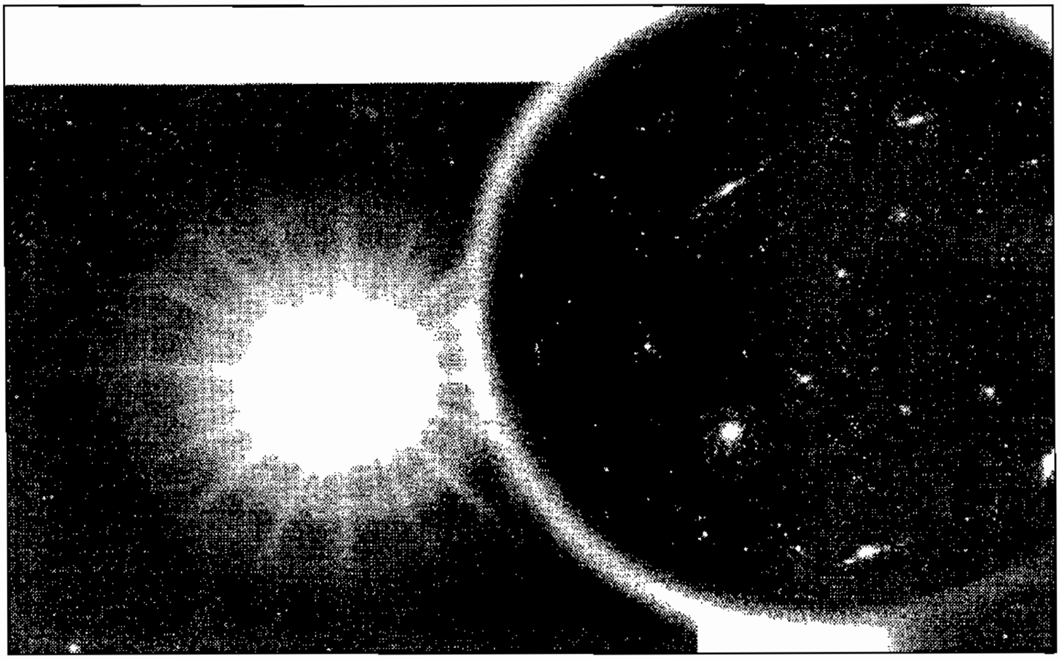

www.banglainternet.com

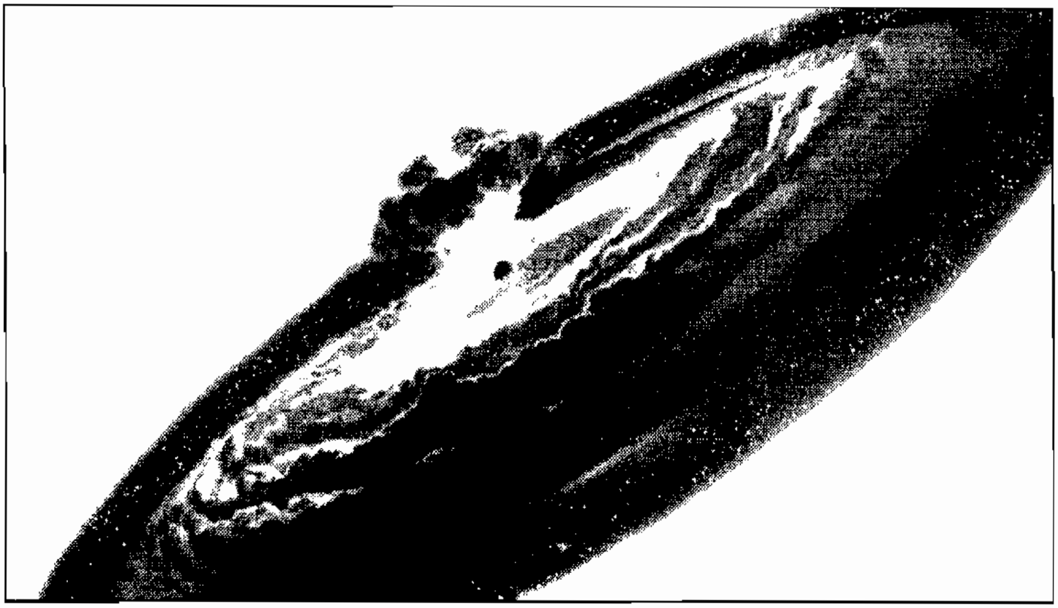

সময় হয়তো তারা পরস্পর মিশে যাবে। সৃষ্টি করবে পূর্ণাঙ্গ গ্যালাক্সি। যতদূর মনে হচ্ছে, গ্যালাক্সিটি একবার আবর্তন করতে সময় নেয় ১ হাজার কোটি বছর। তার ব্যাস আমাদের 'মিলকি ওয়ে গ্যালাক্সি' বা ছায়াপথ নক্ষত্র জগতের ব্যাসের দশ গুণ। আর ভর সূর্যের ভরের ২ হাজার ১ শ' কোটি গুণ বেশি। গিওভার্নেল্লি এবং হেনেসের বক্তব্য, ওই মেঘে আমরা আলোর সন্ধান পাইনি। সেখান থেকে ভেসে আসছে শুধুমাত্র রেডিও তরঙ্গ। এর থেকে মনে হয়, সেখানে কোনো নক্ষত্রও সৃষ্ট হচ্ছে না। মেঘটি অশরীরীর মতোই থেকে যাবে, নাকি নক্ষত্র সৃষ্টি করবে সে কথাও বলা শক্ত। তবে তার অস্তিত্ব যেভাবে ধরা পড়েছে তাতে মনে হয়, তার অন্তর্নিহিত রহস্য উদঘাটিত হলে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির প্রচলিত ধারণা অনেকটা শুধরে নিতে হবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এতকাল লক্ষ্য ছিল কেবলমাত্র দৃশ্যমান বস্তুসামগ্রীরই ওপর। দৃশ্যমান আলোর মাধ্যমে তারা দেখে এসেছেন গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র এবং গ্যালাক্সি। জানা গেছে, এক একটি গ্যালাক্সিতে রয়েছে কম করেও দশ কোটি নক্ষত্র।

কোয়াসার পালসার, ব্ল্যাকহোল, নাক্ষত্রিক জেট—এমন কতরকম বস্তুর কথাই না বলছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।

www.banglainternet.com

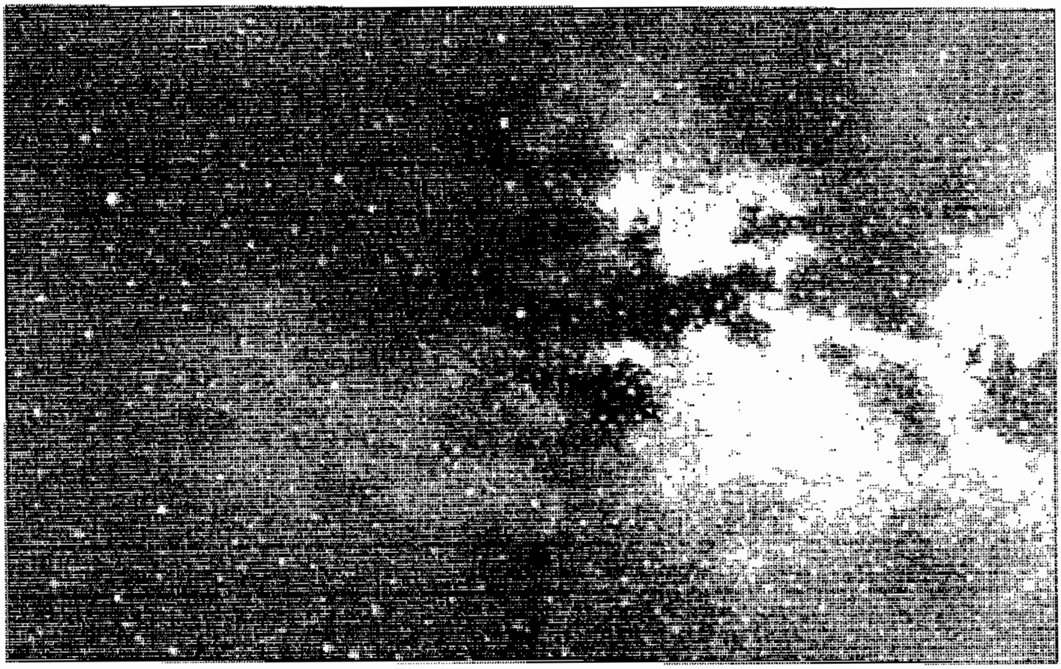

এক্স-রে, রেডিও-তরঙ্গ, গামারশ্মি প্রভৃতি অদৃশ্য রশ্মির মাধ্যমে ধরা পড়েছে, দৃশ্যমান আরও অনেক নক্ষত্র। আমাদের মনে রাখতে হবে ব্রহ্মাণ্ডের অবয়বের যতটা দেখতে পাই, ব্রহ্মাণ্ডের অবয়ব তার চেয়েও বড়। এমনকি যেসব অঞ্চল শূন্য বলে মনে হয় সেখানেও রয়েছে গ্যাসীয় বস্তুসামগ্রী। মুখ্যত হাইড্রোজেন, যৎসামান্য হিলিয়াম এবং অন্যান্য বস্তু। কিন্তু ইদানীং একটি বড় রকমের সমস্যার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। বিকিরণের মাধ্যমে আপাতত যা কিছু ধরা পড়েছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেইটুকুই কি সব? দেখা গেছে, এমন অঞ্চলও রয়েছে, যা আক্ষরিক অর্থে পুরোটাই অন্ধকারে ঢাকা। এ পর্যন্ত কোনো বিকিরণের মাধ্যমে তাদের পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। কী আছে সেখানে? এটাই এখন প্রশ্ন। গণনায় ধরা পড়েছে, ব্রহ্মাণ্ডে এ পর্যন্ত যতটা বস্তুসামগ্রী ধরা পড়েছে, সেটা তার মোট বস্তুসামগ্রীর অংশবিশেষ। আপাতত ১০ শতাংশ বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে।

অনেকের ধারণা, ওই কালো অঞ্চলগুলোর মধ্যে বিরাজ করছে ব্রহ্মাণ্ডের মোট বস্তুসামগ্রীর ৯০ শতাংশ। কীভাবে বিরাজ করছে সেটাই রহস্য। বিগ ব্যাং

www.banglainternet.com

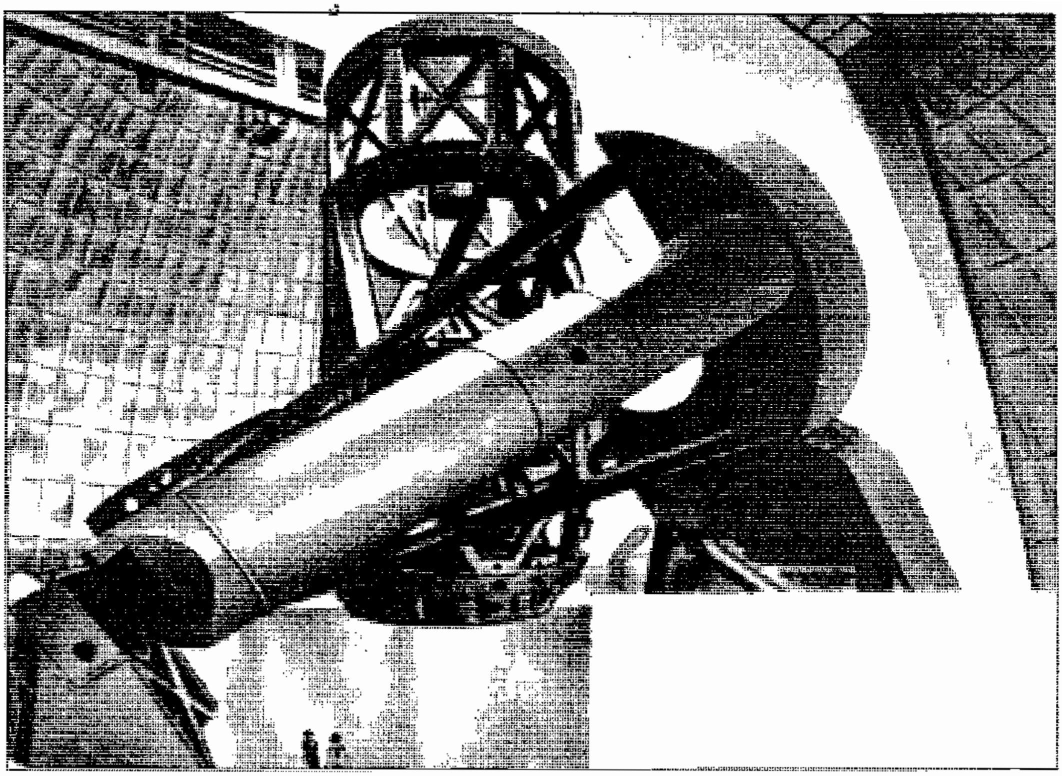

বা মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে প্রায় ১ হাজার ৫ শ' থেকে ২ হাজার কোটি বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল এই মহাবিশ্ব। সেই সৃষ্টির বড় রকমের অংশ নিয়েই ওই সব ঘন কালো অঞ্চল। ওই অঞ্চলগুলোর স্বরূপ উদঘাটনে প্রয়াসী হয়েছেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা।

ক্যানারিজ দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপ লা পামা। সেখানে তারা বসিয়েছেন ৪.২ মিটার ব্যাসের একটি দর্পণ দুরবিন। আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীতে এটির স্থান এখন তৃতীয়।

দুরবিনটির নাম দেয়া হয়েছে উইলিয়াম হার্শেল। এটির সাহায্যে ২ শ' কোটি আলোকবছর দূরত্বের ছবি তোলা সম্ভব হবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আশা, এই দুরবিনটির সাহায্যে তারা উদঘাটন করবেন এই ঘন কালো অঞ্চলগুলোর রহস্য। আর যদি তা সম্ভব হয়, তা হলে জানা যাবে মহাবিশ্বের সঠিক ভর।

www.banglainternet.com

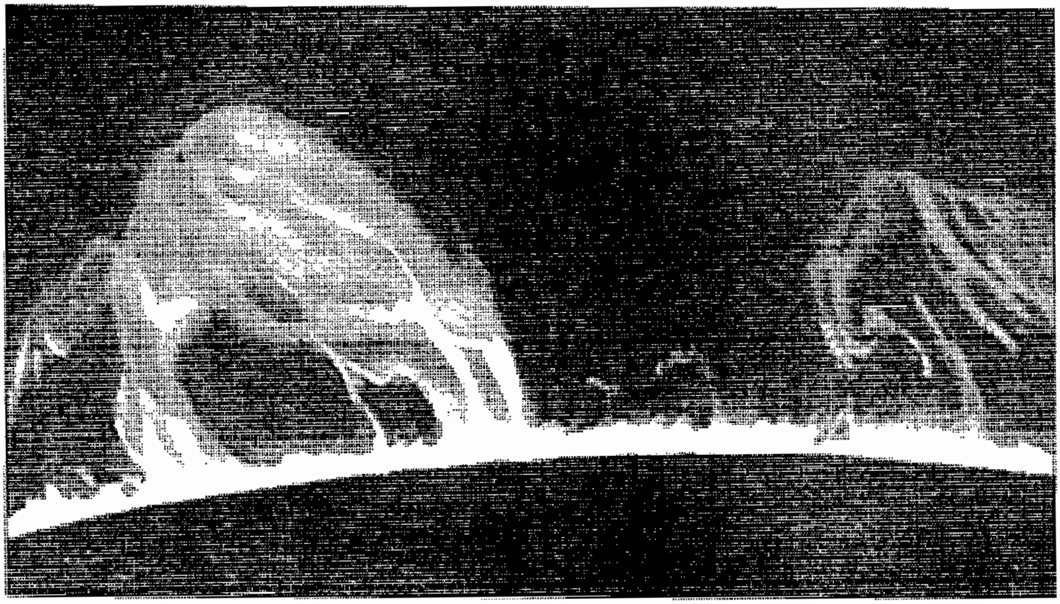

ব্রহ্মাণ্ডের বয়স কত? কোনো কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতে, ১ হাজার ৩ শ' কোটি বছর। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সে তার জন্মের জানান দেয় কান্না হিসেবে। কান্না তার জন্মমুহূর্তের সঙ্কেত। ব্রহ্মাণ্ডের জন্মমুহূর্তেও হয়তো বহন করছে কোনো সঙ্কেত। বিকিরণের মাধ্যমে। বিকিরণবাহিত সেই সঙ্কেত এখনও পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে পারেনি। ফলে সৃষ্টিমুহূর্তে ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপটি কেমন ছিল সে ব্যাপারে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অন্ধকারেই থেকে গেছেন। সম্ভবত সেই অন্ধকার এবার হয়তো দূর হবে।

কেমব্রিজের ইনস্টিটিউট অব অ্যাসট্রোনমির জ্যোতির্বিজ্ঞানী রিচার্ড ম্যাকমোহন, রয়েল গ্রিনিচ অবজারভেটরির মাইকেল আরউইন এবং পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিরিল হ্যাজারড নতুন একটি কোয়াসারের সন্ধান পেয়েছেন, যার নাম রেখেছেন তারা।

তাদের দাবি , এ পর্যন্ত যতগুলো কোয়াসার দেখা গেছে, এটিই তাদের মধ্যে দূরতম। এটি আমাদের মিলকিওয়ে বা ছায়াপথ গ্যালাক্সি থেকে ১০ হাজার গুণ উজ্জ্বল।

বয়স ১ হাজার ২ শ' কোটি বছর। যার অর্থ, এই কোয়াসারটি থেকে যে

www.banglainternet.com

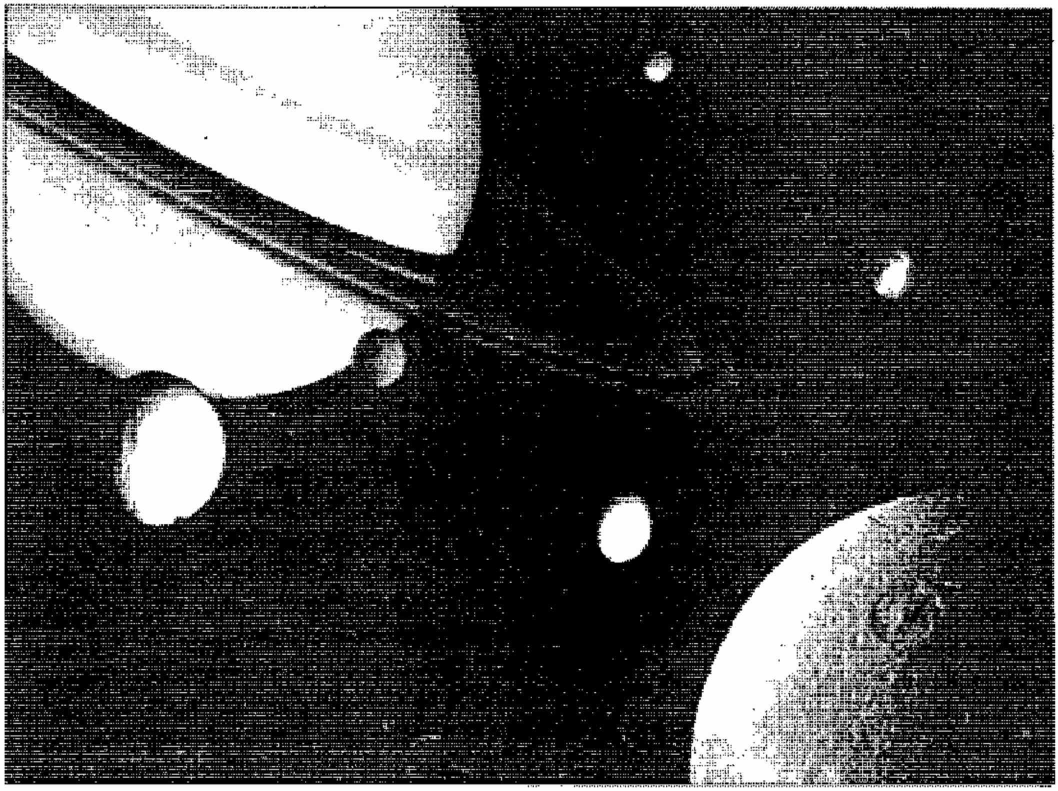

বিকিরণ এসে পৌঁছাচ্ছে বয়সের দিক থেকে সেটা প্রাচীনতম। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ১ শ' কোটি বছর পর কী ঘটেছিল এই বিকিরণ তার সঙ্কেত বয়ে আনছে।

আধুনিক মতবাদ

কোয়াসারের মূল প্রাণকেন্দ্র হলো অতিকায় ব্ল্যাক হোল। নবজাতক গ্যালাক্সির কেন্দ্রস্থলে তার অবস্থান। তার প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণে মহাজাগতিক পরিমণ্ডলে বস্তুসামগ্রী তার কেন্দ্রে এসে পুঞ্জীভূত হয়। ওই সময় তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির একটি বড় অংশ সৃষ্টি করে প্রবল বিকিরণ। এর জন্য কোয়াসারগুলো সাধারণ নক্ষত্রের চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ উজ্জ্বল দেখায়। বলা হয়েছে এর ভর সূর্যের ভরের চেয়ে ১ হাজার কোটি গুণ বেশি। মহাকাশ পরিমণ্ডল থেকে প্রতি বছর এটি শোষণ করে ১ শ' সূর্যের সমপরিমাণ ভরবিশিষ্ট বস্তুসামগ্রী।

www.banglainternet.com

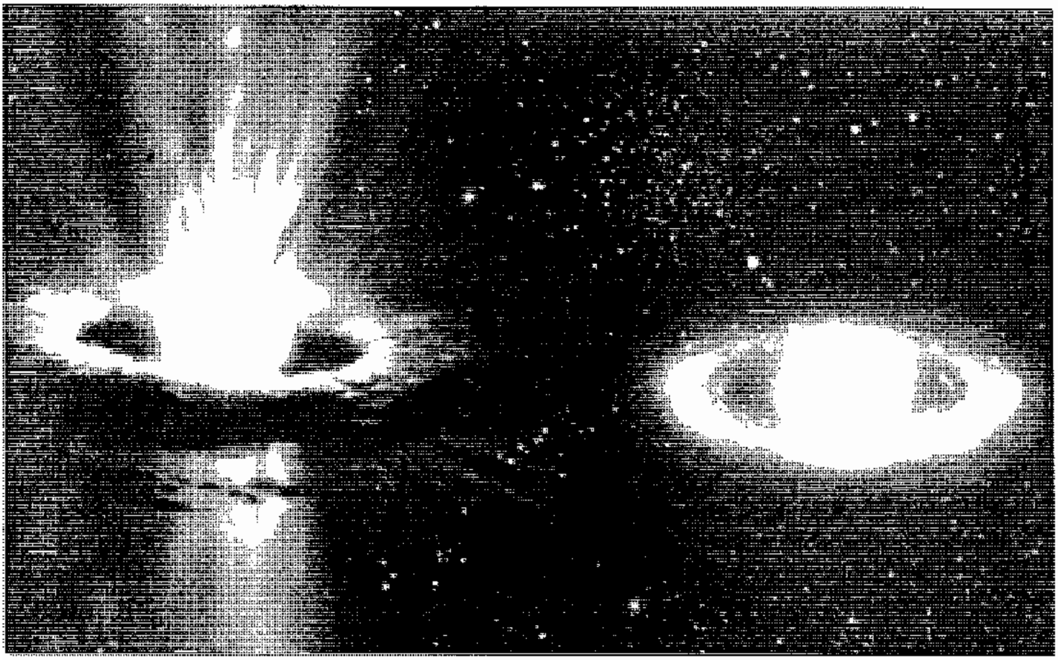

নক্ষত্রের জন্ম-মৃত্যু

এই মহাবিশ্ব যখন সৃষ্টি হয়নি তখন সমস্ত বস্তু ছিল খুব ঘনীভূত অবস্থায়। ছোট একটু জায়গাতে আবদ্ধ। অনেকটা যেন ডিমের খোলসের মাঝে আটকানো। তাই সেই অবস্থায় নাম দেয়া হলো মহাজাগতিক ডিম বা কসমিক এগ।

তারপর ঘটল সেই মহাবিস্ফোরণ। বিগ ব্যাং। প্রায় দু'হাজার কোটি বছর আগের সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে মহাজাগতিক ডিমটি গেল ফেটে। আর তখন থেকেই শুরু হলো মহাবিশ্বের প্রসারণ। এখনও তা চলছে। মহাবিশ্ব বাতাস ঢোকা বেলুনের মতো ফুলছে।

প্রচণ্ড সেই বিস্ফোরণের সময় তাপমাত্রা ছিল অকল্পনীয়। বিস্ফোরণের সময়ে সমস্ত বস্তু ছিল শক্তির আকারে। তারপর থেকেই সেই শক্তি বস্তুতে রূপান্তরিত হতে শুরু করল। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এই ধারণার কথা বলেছেন আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বে। বস্তু শক্তিতে আর শক্তি বস্তুতে রূপান্তরিত হয়।

এই রূপান্তরক্রিয়ায় মহাবিস্ফোরণের অল্প সময়ের মাঝেই প্রোটন কণিকা দেখা দিল। তা থেকে সৃষ্টি হলো হাইড্রোজেন। তারপর হাইড্রোজেন পরমাণুর

www.banglainternet.com

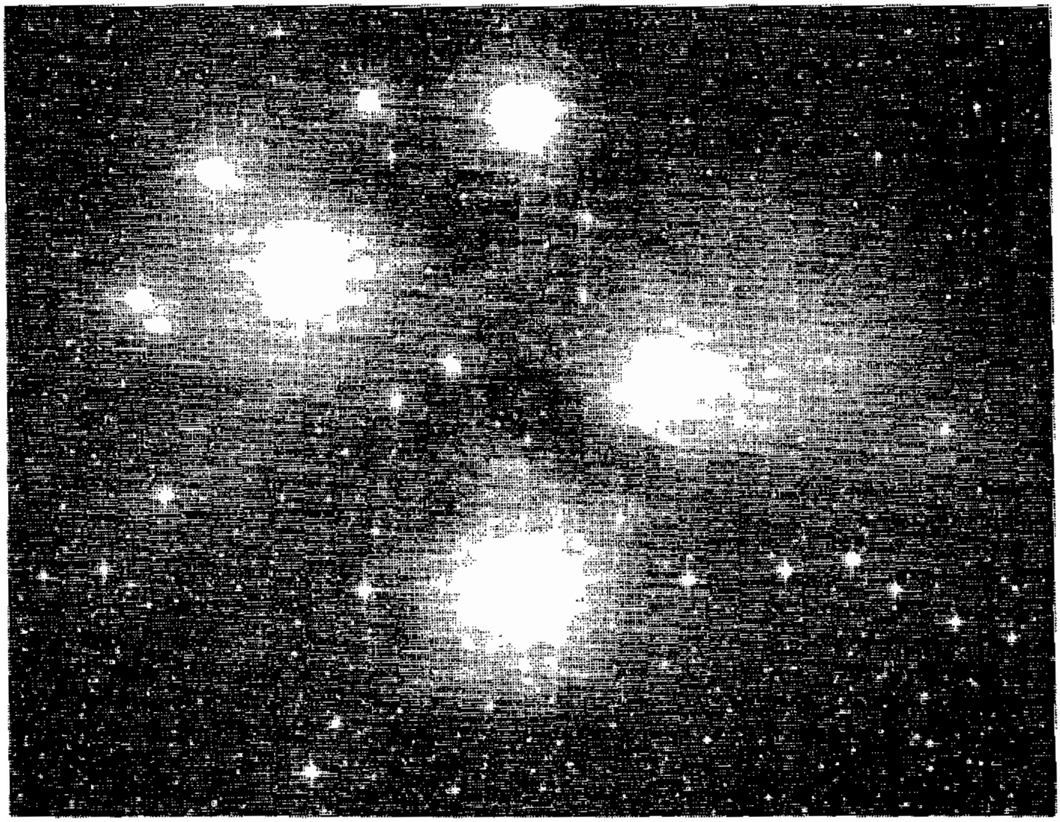

সংযোগে তৈরি হলো হিলিয়াম পরমাণু। মহাবিশ্বের তখনকার আকার ছিল হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম গ্যাসের এক ঘন অন্ধকার বায়বীয় সমুদ্রের মতো।

কেটে গেল লক্ষ লক্ষ বছর। সেই গ্যাস বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘনীভূত হলো। সৃষ্টি করল একেকটি ছায়াপথ। ছায়াপথগুলো আবার দল বাঁধাল কোথাও। তার নাম দেয়া হলো গুচ্ছ ছায়াপথ। আমাদের ছায়াপথও এমনি এক গুচ্ছের অন্তর্গত। এই গুচ্ছে রয়েছে একুশটি ছায়াপথ। এই গুচ্ছের ব্যাস হলো তিরিশ লক্ষ আলোকবর্ষ। একটি থেকে অন্য ছায়াপথের দূরত্ব প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ।

এই ছায়াপথগুচ্ছের প্রায় পাঁচ কোটি আলোকবর্ষ দূরে আছে 'ভিরগো গুচ্ছ'। যার মাঝে আছে অন্তত এক হাজারটি ছায়াপথ। এ রকম কোটি কোটি ছায়াপথ ছড়িয়ে আছে মহাবিশ্বজুড়ে।

www.banglainternet.com

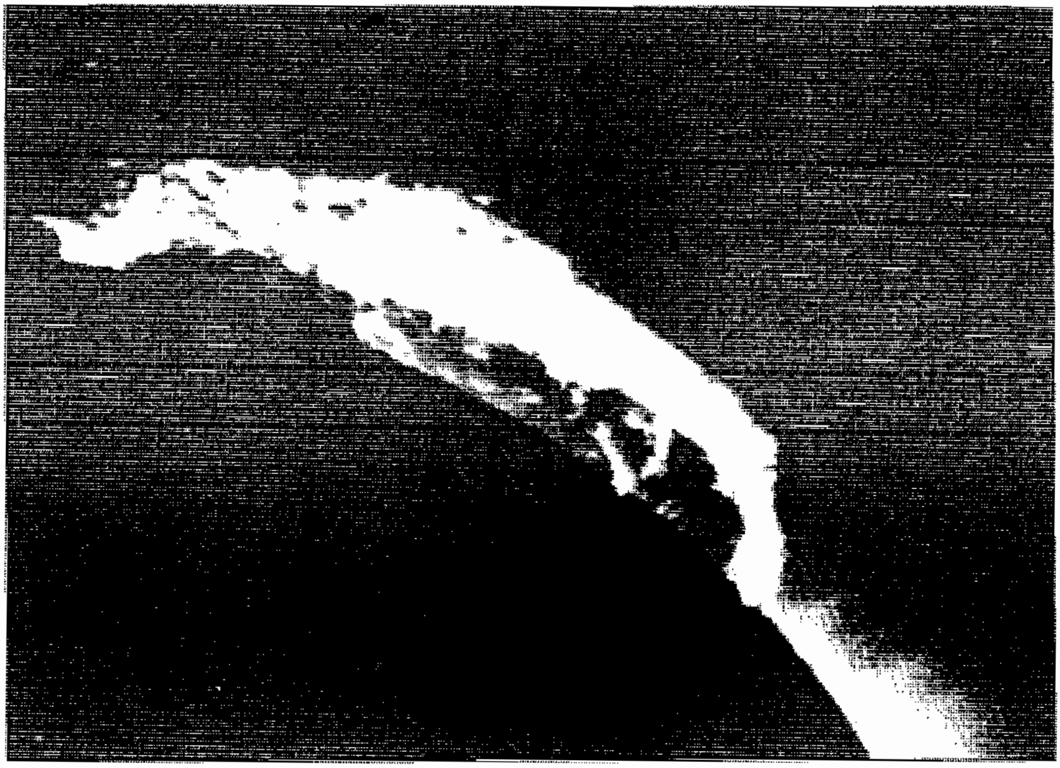

ধীরে ধীরে একেকটি ছায়াপথের ভেতরে গ্যাস ঘনীভূত হয়েছে। সৃষ্টি করেছে কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র। জীবের মতো নক্ষত্রেরও জন্ম-মৃত্যু আছে। মৃত্যুর আগে কোনো কোনো নক্ষত্র লাল হয়ে ফুলে ওঠে। তারপর ছোট হয়ে নিভে যায়। কোনো নক্ষত্র ফেটে পড়ে।

প্রতিটি নক্ষত্র হলো জ্বলন্ত গ্যাসের গোলক। এই গোলকের ভেতরে অবিরাম চলছে তাপ পারমাণবিক ক্রিয়া। এই প্রচণ্ড শক্তিই নক্ষত্রদের জীবন্ত রেখেছে কোটি কোটি বছর ধরে।

সূর্যের চেয়ে কিছুটা ভারী নক্ষত্রের বেলায় কেন্দ্রাংশে লোহা তৈরি হওয়া মাত্র সেখানে থেমে যায় তাপ পারমাণবিক ক্রিয়া। অভিকর্ষের প্রবল চাপে তখন ফেটে পড়ে কেন্দ্রটি। এর ফলে তাপমাত্রা যায় বেড়ে। গোটা নক্ষত্র প্রচুর তাপ আর আলো নিয়ে যেন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। এ রকম ফেটে পড়া নক্ষত্রকে বলা হয় সুপারনোভা।

www.banglainternet.com

সুপারনোভা

নোভা মানে নতুন। প্রাচীনকালের মানুষ যখন আকাশে হঠাৎ করে দেখত মশালের মতো আলো জ্বলছে, ভাবত নতুন একটি তারার জন্ম হলো বুঝি।

প্রতি বছর প্রায় বিশ-ত্রিশটি নক্ষত্র নোভা হয়ে যায়। এই উজ্জ্বলতা যখন প্রচণ্ড হয় তখন বলে সুপারনোভা।

প্রকৃতির এক রহস্যময় প্রক্রিয়া এই সুপারনোভা। এর অর্থ একটি তারার অকল্পনীয়ভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা। এতে তারার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পেয়ে যায় প্রায় কোটি গুণ। কয়েক মাস পর্যন্ত থাকে এই উজ্জ্বলতা। তারপর ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসে।

প্রাচীনকালের জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে সুপারনোভার উল্লেখ আছে। প্রথম তথ্যটি পাওয়া যায় ১০৪৫ খ্রিস্টাব্দে লেখা চীন দেশের এক প্রাচীন নথিতে। সেখানে বর্ণনা আছে সম্রাট চি হোর রাজত্বকালের প্রথম বছরের পঞ্চম মাসে তিয়েন হুয়ান নক্ষত্রের (বর্তমান নাম জিটা টওরি) একটু দূরে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটা অতিথি তারার আবির্ভাব হয়েছিল। প্রায় বছরখানেক পরে এটি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।

www.banglainternet.com

এর পরের বর্ণনাটি পাওয়া যায় জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহের লেখায় ১৫৭২ সালে। তখনও দুরবিন আবিষ্কৃত হয়নি। টাইকো লক্ষ করেন, আশপাশের নক্ষত্রগুলোর মাঝখানে হঠাৎ একটি নক্ষত্র উজ্জ্বল হতে শুরু করল। দিনের পর দিন বাড়তে লাগল সেই উজ্জ্বলতা। বিভিন্ন নক্ষত্রের তুলনায় সেই উজ্জ্বলতা বেড়েই চলল। মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন তিনি।

১৬০৬ সালে জোহান কেপলার দেন পরের বিবরণ।

এ পর্যন্ত এই নক্ষত্রজগতে মোট ৫টি সুপারনোভার উপর পর্যবেক্ষণের বিবরণ পাওয়া গেছে।

এই শতাব্দীর চতুর্থ দশকে সুপারনোভার স্বরূপ প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন আমেরিকার দুই বিজ্ঞানী ফ্রিটজ জুইকি ও ওয়ালটার বাডে। সুপারনোভা নামটি তাদের দেয়া।

সুপারনোভার অবস্থান নভোমণ্ডলের ৬৯ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশে অবস্থিত। অর্থাৎ পৃথিবীর ২০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এটা দেখা সম্ভব।

www.banglainternet.com

বিস্ফোরণের পর ওই সব নক্ষত্রের ধ্বংসাবশেষ বিশাল এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। বিস্ফোরণের কেন্দ্রস্থল থেকে সেকেন্ডে ১০ হাজার কিলোমিটার বেগে বাইরের অঞ্চলে ছুটে চলেছে।

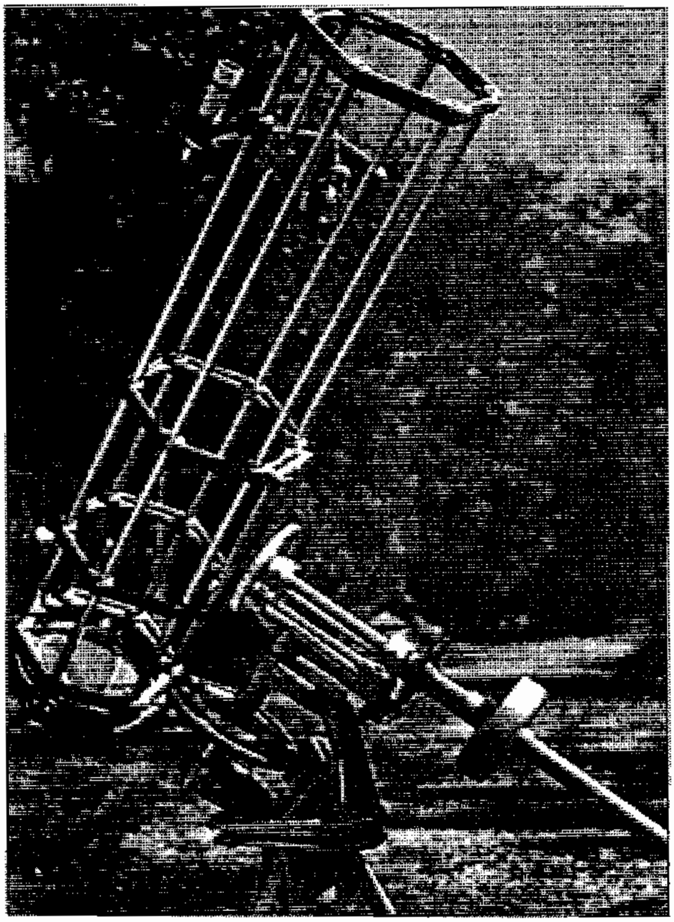

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই ধ্বংসাবশেষের প্রতি যথেষ্ট কৌতূহলী। তারা অনুমান করছেন, এসবের মাঝেই নিহিত আছে মহাবিশ্ব সৃষ্টির অনেক রহস্য।

১৯৮৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে উত্তর চিলির লা কাম্পানাস মানমন্দিরের ১০ ইঞ্চি ব্যাসার্ধের টেলিস্কোপে ধরা পড়ল একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণের আলোর বিচ্ছুরণের ছবি। প্রায় ২ লক্ষ বছর আগে ১ লক্ষ ৭০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে মাগেলান মেঘপুঞ্জে এই নক্ষত্রের বিস্ফোরণ ঘটেছিল। এই বিস্ফোরণের সময় পৃথিবীতে চলছিল তুষার যুগ। সেই নক্ষত্র বিস্ফোরণের আলো ছিল কোটি সূর্যের সমান। সেই আলো ছুটতে থাকে মহাকাশের বিভিন্ন দিকে। সেই আলোর ছবি এলো এতদিন পর। কানাডার টরেনটো বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ বিজ্ঞানী আয়ান শেলটন লা কাম্পানাসের টেলিস্কোপে প্রথম এই সুপারনোভার ছবি দেখেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, প্রতি হাজার বছরে অন্তত চার বার নক্ষত্র বিস্ফোরণ হবার কথা ছায়াপথে।

www.banglainternet.com

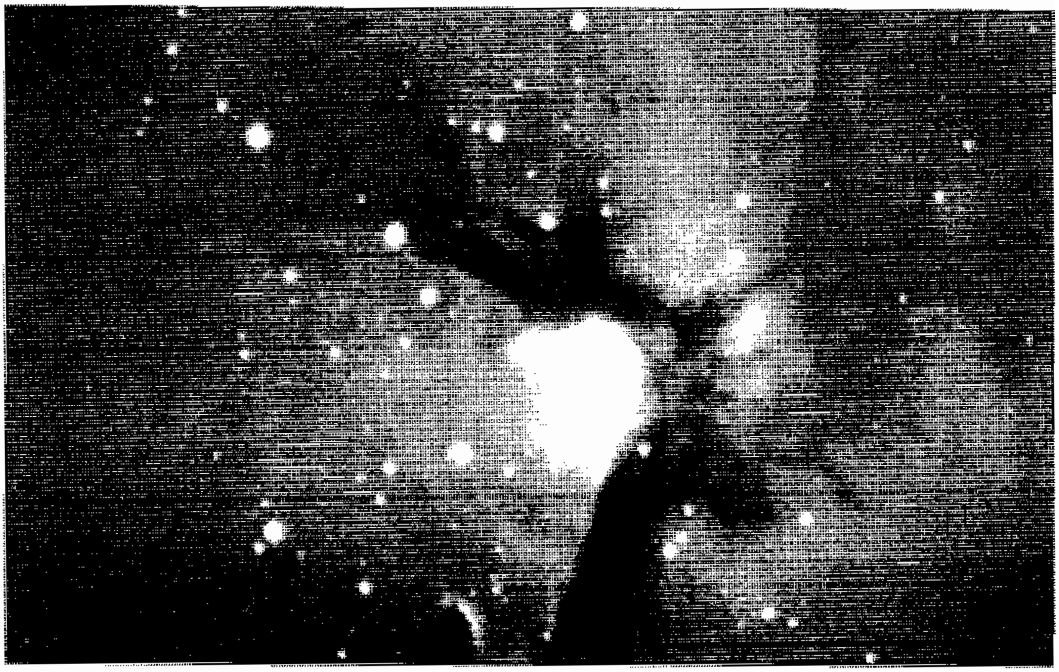

১৮৮৫ সালে অ্যান্ড্রোমিডা ছায়াপথে সুপারনোভা হয়েছিল। পৃথিবী থেকে ২.২ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে।

পালসার

সুপারনোভার বিস্ফোরণের পর নক্ষত্রের বেশির ভাগ অংশ বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যায় মহাশূন্যে। পড়ে থাকে খুব ভারী লৌহময় কেন্দ্র। সেই কেন্দ্রের ওপর বাড়তে থাকে নক্ষত্রের নিজস্ব অভিকর্ষীয় চাপ। শেষে সেটা খুব চাপ খাওয়া নিউট্রনের একটা জমাট কঠিন পিণ্ডে পরিণত হয়।

নিউট্রন নক্ষত্রের ঘনত্ব অকল্পনীয়। এর এক চামচ পদার্থের ওজন পৃথিবীর হিসেবে প্রায় এক কোটি টন।

১৯৬৭ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিউরিস ও তার সহকর্মীরা আবিষ্কার করলেন পালসার। নিউট্রন নক্ষত্রকেই বলা হয় পালসার। এই পালসারগুলো দ্রুত চক্রাকারে ঘূর্ণনশীল নিউট্রন নক্ষত্র। প্রতি সেকেন্ডে একবার করে বিকিরণ স্পন্দন ছড়িয়ে যাচ্ছে পালসারগুলো।

www.banglainternet.com

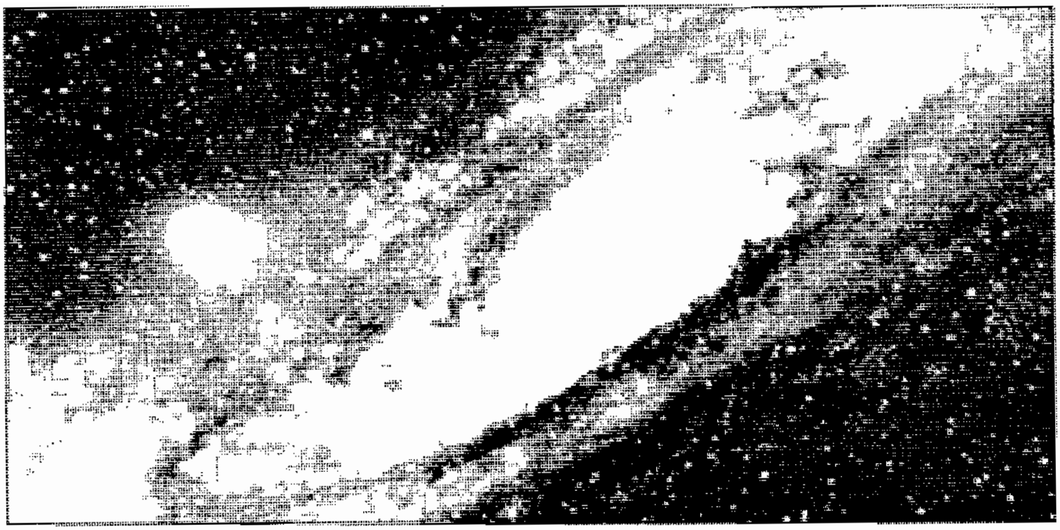

এ পর্যন্ত তিনশোর বেশি পালসারের সন্ধান পাওয়া গেছে।

১৯৮৬ সালের অক্টোবর মাসে সাগিট্রা নক্ষত্রমণ্ডলে একটি পালসার আবিষ্কৃত হয়। এটা নিজের অক্ষের চারপাশে প্রতি সেকেন্ডে ৬২২ বার আবর্তন করছে। এর অর্থ হলো, এই পালসারের বেতার সঙ্কেত সেকেন্ডে ৬২২ বার পর্যায়ক্রমে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য হচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা এর ওপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে বিস্ময়কর কিছু তথ্য পেলেন। দেখা গেল, প্রতি নয় ঘণ্টা অন্তর অদৃশ্য হচ্ছে পালসারটি। এতে প্রমাণিত হলো পালসারটির কোনো সাথী নক্ষত্র আছে। পরস্পরকে তারা পরিক্রমণ করছে প্রতি নয় ঘণ্টা দশ মিনিটে। এই পরিক্রমণের সময় পালসারটি দ্বিতীয় নক্ষত্রটির আড়ালে আসে বলেই সেটি অদৃশ্য হয়ে যায়।

দ্রুত ঘূর্ণায়মান পালসারের বিকিরণ শক্তির প্রভাবে সাথী নক্ষত্রটি প্রচণ্ডভাবে গরম হয়ে ওঠে। টগবগ করে ফুটতে শুরু করে। এর ফলে নক্ষত্রটির বস্তু সামগ্রী বাষ্প হিসেবে মহাকাশে ছড়িয়ে যায়।

কোয়াসার

কোয়াসার হলো সুদূরতম মহাশূন্যের অতি বিকিরণশীল এক ধরনের জ্যোতিষ্ক। একেকটি কোয়াসার উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের চেয়েও কোটি কোটি গুণ শক্তিধর।

www.banglainternet.com

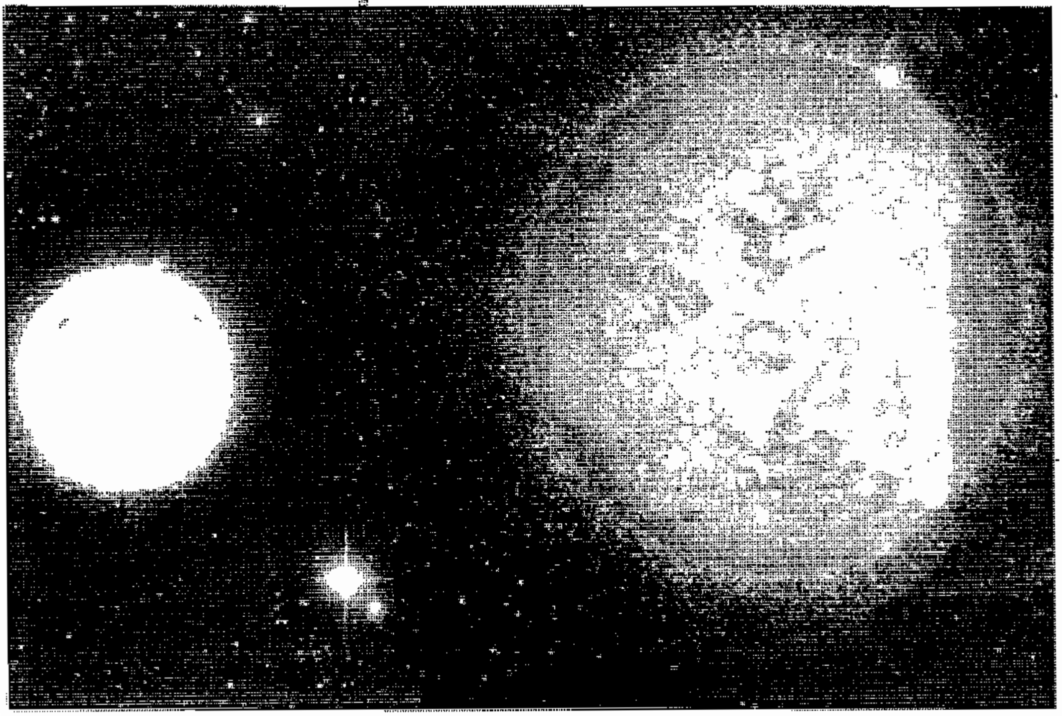

১৯৬৩ সালে বিজ্ঞানীরা প্রথম স্বতন্ত্রভাবে কোয়াসার আবিষ্কার করেন। কোয়াসারগুলো তীব্র বেতার তরঙ্গ পাঠায়। এদের বর্ণালি অসাধারণ। এগুলো বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, কোয়াসারগুলো আমাদের ছায়াপথের নক্ষত্র নয়। এদের দূরত্ব পৃথিবী থেকে যথাক্রমে ৫ শত কোটি এবং ৩ শত কোটি আলোকবছর।

মহাবিশ্বের সঙ্কেত

পালসার বা কোয়াসার থেকে যে বেতার সঙ্কেত পৃথিবীতে আসছে তা বিজ্ঞানীদের আলোড়িত করেছে।

১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে এ ধরনের যে সঙ্কেত আসছিল তা বহু বিজ্ঞানীকে উত্তেজিত করেছিল। নিখুঁতভাবে আসছিল সঙ্কেত ধ্বনি। দু'টি সঙ্কেতের মধ্যে সময়ের ব্যবধান সব সময় একই থাকছে। প্রচণ্ড কৌতূহলের সৃষ্টি করল এই সঙ্কেত।

www.banglainternet.com

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মার্টিন রাইলের বক্তব্য, আমরা প্রথমে ধারণা করেছিলাম হয়তো কোনো উচ্চস্তরের প্রাণী আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চাইছে। পরে যখন ওই একই ধরনের সঙ্কেত আকাশের বিভিন্ন স্থান থেকে আমরা পেলাম তখন পূর্বের ধারণা আমরা বাতিল করতে বাধ্য হলাম। এ কি করে সম্ভব যে একই সময়ে আকাশের নানা স্থান থেকে উচ্চস্তরের সভ্যতা বিপুল শক্তির বিনিময়ে পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করতে চাইছে।

আরেসিবোর শক্তিশালী বেতার টেলিস্কোপে এই তরঙ্গ ধরা পড়ল। সেই মানমন্দিরে আছে প্রযুক্তির আধুনিকতম প্রয়োগ। এক হাজার ফুট ব্যাসের প্রতিফলক। আণবিক ঘড়ি সেখানে এক সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগের মতো সূক্ষ্ম সময় হিসেব করতে পারে।

বিশ একর জায়গা জুড়ে রয়েছে গোল থালার মতো প্রতিফলক।

মহাশূন্য থেকে সঙ্কেত এসে ধরা পড়ছে সেখানে।

বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের অজানা তথ্য আবিষ্কারে মগ্ন।

গ্রহাণু

গ্রহ ছাড়াও সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহের অনুরূপ ক্ষুদ্রাকার বস্তুখণ্ড আবর্তিত হচ্ছে। এদের বলে গ্রহাণু। ১৮০১ সালে প্রথম গ্রহাণুর সন্ধান পাওয়া গেল। গ্রহাণুদের মধ্যে বৃহত্তম হচ্ছে সিরিস। যার ব্যাস ৬৮৩ কিলোমিটার। তারপর ৫৯২ কিলোমিটর ব্যাসের ভেস্তা। এই গ্রহাণুটি রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে। বেশিরভাগ গ্রহাণুর কক্ষপথ বৃত্তাকার। মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝে গ্রহাণুপুঞ্জ রয়েছে। বেশিরভাগ গ্রহাণু পাথর দিয়ে তৈরি।

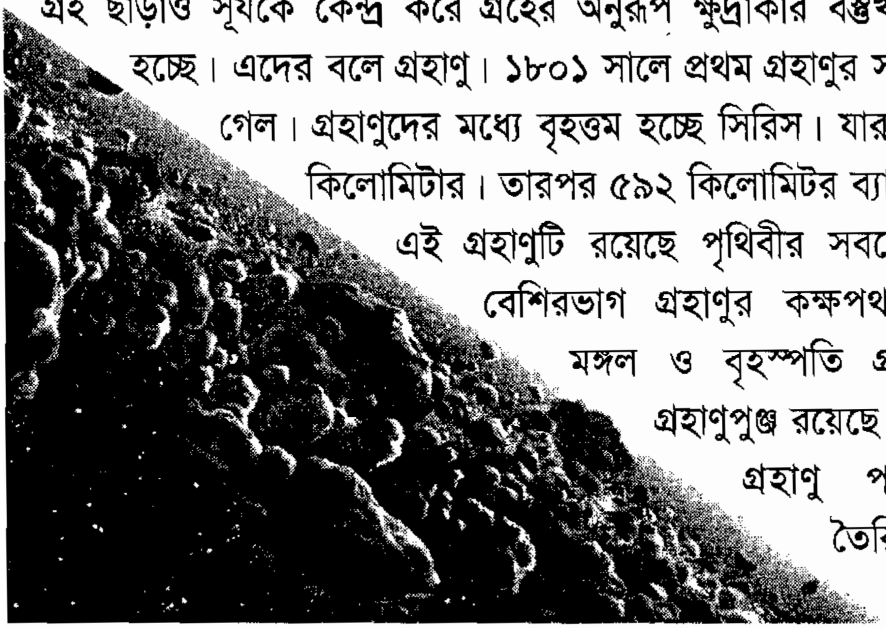

www.banglainternet.com

ধূমকেতু

ধূমকেতু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে রহস্য ও বিস্ময়ের ব্যাপার এখনও। এক দুর্লভ গবেষণার বিষয়। বলা যেতে পারে যেন এক মহাজাগতিক ধাঁধা। ধূমকেতু দেখতে অদ্ভুত ধরনের। সামনে গোলাকার মাথা আর পেছনের উজ্জ্বল লেজ। অত্যন্ত দীর্ঘ এক ডিম্বাকার পথে এটা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে রোমান দার্শনিক সেনেকা প্রথম বললেন, ধূমকেতুরা পৃথিবীর সম্পূর্ণ বাইরের বস্তু এবং নির্দিষ্ট পথে গমনাগমন করে।

ধূমকেতুর নভোমণ্ডলীয় চরিত্র সম্পর্কে প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালান টাইকো ব্রাহে। ১৫৭৭ সালে একটি উজ্জ্বল ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটেছিল।

ধূমকেতুর স্বরূপ এখনও পুরোপুরিভাবে প্রকাশিত হয়নি বিজ্ঞানীদের কাছে। যতটুক জানা গেছে তা হলো, ধূমকেতু আসলে একটি বরফের গোলা। গ্যাস জমে এই বরফের সৃষ্টি। এর মধ্যে আরও আছে ধূলিকণা, পাথরের টুকরো।

সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরতে কোনো কোনো ধূমকেতুর সময় লাগে কয়েক হাজার, এমনকি কয়েক লক্ষ বছর। ধূমকেতুর নিজস্ব কোনো আলো নেই। সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয় বলেই ধূমকেতুর গ্যাসপুঞ্জ ও ধূলিকণাকে উজ্জ্বল দেখায়।

www.banglainternet.com

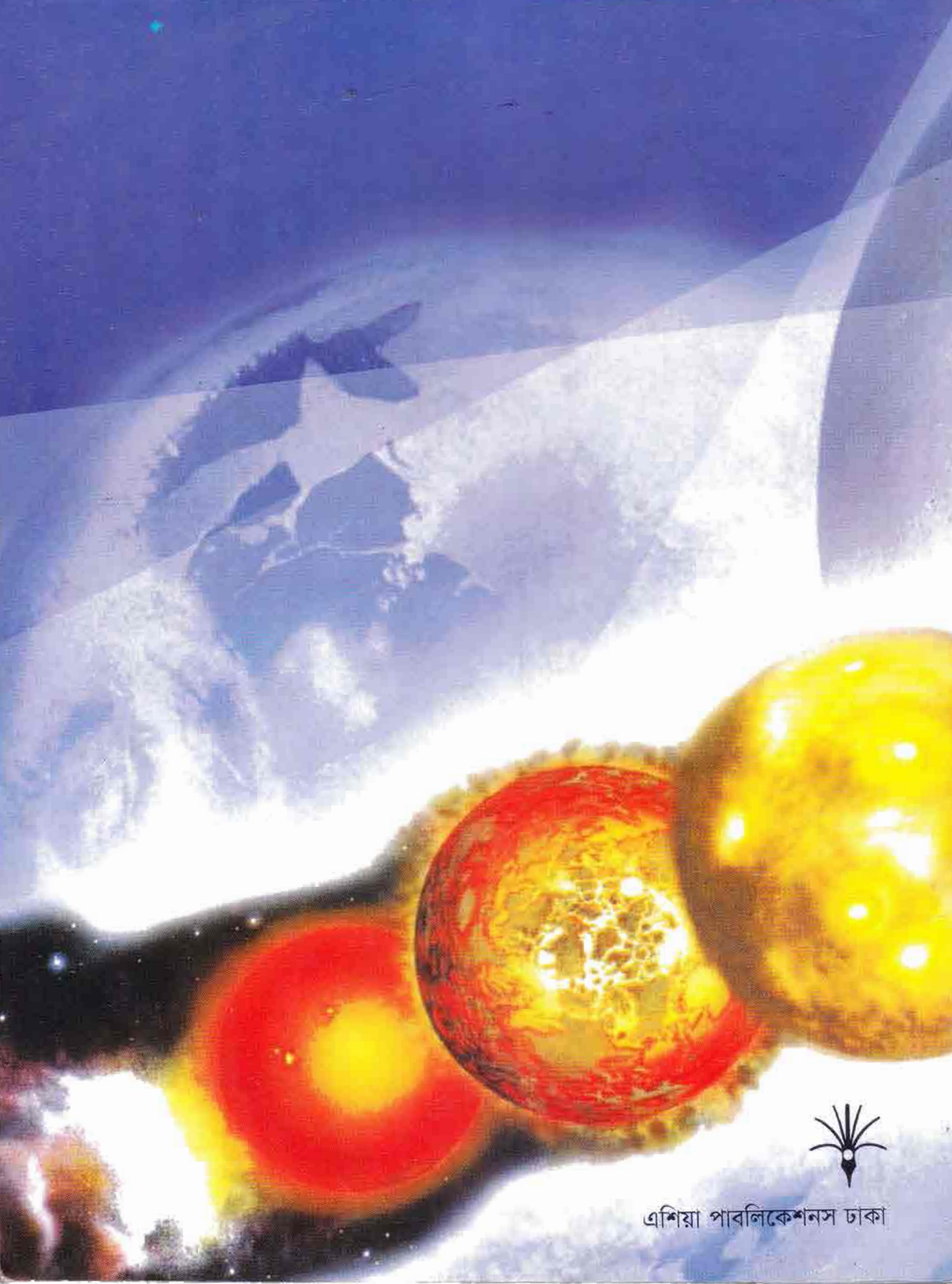

এশিয়া পাবলিকেশনস ঢাকা